দুর্নীতি দমনে সরকারি উদ্যোগ ও নাগরিক উদ্বেগ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)

"সরকারী কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোন different class (ভিন্ন শ্রেনীর) নয়। ... আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর, কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, মজদুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তাঁরা পেতে পারে না। সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন – তাঁরা সেবক।" – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, গণপরিষদের শেষ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, পরিষদ-বিতর্ক, ৪ নভেম্বর, ১৯৭২।

দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের দেশে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। বস্তুত দুর্নীতি আজ আমাদের সমাজে একটি সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এমনি প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান মহাজোট সরকার দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার অঙ্গীকার প্রদান করে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু সরকারের মেয়াদ প্রায় ২৬ মাস অতিবাহিত হলেও এ ব্যাপারে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য সফলতা নেই। বরং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোসকামিতা এবং আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে দুদককে অকার্যকর ও অর্থহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সাম্প্রতিক উদ্যোগ নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে চরমভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। আমাদের উদ্বেগের কারণ তুলে ধরাই আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য।

দুর্নীতির ব্যাপকতা

অবৈধ আর্থিক লেনদেনকে সাধারণত দুর্নীতি বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু দুর্নীতির সংজ্ঞা ও পরিধি আরও ব্যাপক। 'ব্লাক ল ডিকসেনারি' অনুযায়ী, দুর্নীতি হল ব্যক্তির লাভের জন্য ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে ব্যক্তি স্বার্থকে জনস্বার্থ বা জনসেবার নীতি-আদর্শের উর্ধ্বে বিবেচনা করাই দুর্নীতি। ব্লাক ল ডিকসেনারি দুর্নীতিকে অনেকভাবে বিভাজন করেছে - যেমন, রাজনৈতিক দুর্নীতি, ব্যবসায়িক দুর্নীতি, তথ্যভিত্তিক দুর্নীতি ইত্যাদি।

তাই আর্থিক অসততার বাইরেও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জিম্মি করা, উৎকোচ গ্রহণ, উপঢৌকন আদায়, ফায়দা প্রদান ইত্যাদি – যা আমাদের দেশে ব্যাপক – নিঃসন্দেহে দুর্নীতি। ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে তদবিরের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে চাকুরি, ঠিকাদারি ও অন্যান্য ন্যায্যপ্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা দুর্নীতির আওতায় পড়ে। ক্ষমতা খাটিয়ে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ – যেমন, সরকারি খরচে নিয়ম বহির্ভুতভাবে মন্ত্রীদের ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ির উন্নয়ন, আবাসিক এলাকায় প্লট প্রাপ্তি ইত্যাদি – দুর্নীতির অংশ। রাগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে কিংবা জনস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তি বা কোটারি স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণও দুর্নীতি। নিজের বিবেক-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থে মোসাহেবিপনায় লিপ্ত হওয়াও অসততার – বুদ্ধিভিত্তিক অসততার (intellectual dishonesty) – মধ্যে পড়ে। উপরিউক্ত শাখা-প্রশাখাগুলো অন্তর্ভুক্ত করলে দুর্নীতি আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃত এবং সমাজের উপরের তলার খুব কম ব্যক্তিই এর থেকে মুক্ত।

কেউ প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বিশেষত আর্থিক দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় না এবং এর তথ্যও প্রকাশ করে না। একমাত্র তদন্ত ও গভীর নিরীক্ষণের মাধ্যমেই দুর্নীতির তথ্য উদঘাটন সম্ভব। তাই দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সহজপ্রাপ্য নয়। ফলে দুর্নীতি আমাদের দেশে ব্যাপক হলেও এর নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথাও নেই। জরিপের মাধ্যমে এর ব্যাপকতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র।

বাংলাদেশে সরকারি খাতের দুর্নীতির ব্যাপকতার মোটাদাগে প্রতিফলন দেখা যায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রকাশিত দুর্নীতির সূচক বা 'করাপশান পারসেপশন ইনডেক্স' থেকে, প্রতিবছর যা বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। মোট ১০টি জরিপের ফলাফল থেকে (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যার সংখ্যা ৭) এটি তৈরি করা হয়। টিআই ঘোষিত সর্বশেষ (২০১০) সূচক অনুযায়ী, ০-১০ স্কেলে বাংলাদেশ ২.৪ স্কোর পেয়ে ১৭৮টি দেশের তালিকায় নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বাদশ স্থানে নেমে এসেছে। আগের বছর বাংলাদেশের স্কোর ছিল একই (২.৪) এবং অবস্থান ত্রয়োদশ। অর্থাৎ ১৮০টি দেশের মধ্যে গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম থেকে ১৩৪তম স্থানে পরিবর্তিত হয়েছে – একাধিক দেশ একই স্কোর পাওয়ায় তা ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালে দুর্নীতির সূচক আগের বছরের ২.১ স্কোর ও দশম স্থান থেকে ২.৪ স্কোর ও এয়োদশ স্থানে উন্নীত করেছে, যা কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ২০১০ সালে দুর্নীতি দূরীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।

দুর্নীতির ধারণা সূচক

মানদণ্ড	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫
অবস্থান	১৭৮টি দেশের মধ্যে ১৩৪	১৮০টি দেশের মধ্যে ১৩৯	১৮০টি দেশের মধ্যে ১৭০	১৭৯টি দেশের মধ্যে ১৭২	১৬৩টি দেশের মধ্যে ১৬০	১৫৮টি দেশের মধ্যে ১৫৮
	দ্বাদশ	এয়োদশ	দশম	সপ্তম	তৃতীয়	প্রথম
স্কোর (১-১০)*	২.৪	২.৪	২.১	২.০	২.০	১.৭

*বেশি স্কোর মানে সরকারি খাতে কম দুর্নীতি

প্রসঙ্গত, যে সব দেশের স্কোর ৩-এর কম, ধরে নেওয়া হয় যে, সেসব দেশে দুর্নীতি ব্যাপক ও ভয়াবহ। এছাড়া যদিও ২০০৮ সালের ২.১ থেকে ২০০৯ সালের ২.৪ স্কোরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য নেই, তবুও এতে প্রদর্শিত হয়েছে সূচকের নিম্ন গতি। কিন্তু ২০১০ সালে স্কোর অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছে, যা আশাবাদ সৃষ্টি করে না। প্রতিবেশীদের সাথে তুলনা করলেও এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়ার অবকাশ থাকে না। দুর্ভাগ্যবশত শ্রীলংকা, ভূটান ও ভারত ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্কোর বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। যেমন, ভারতের স্কোর ৩.৩, মালদ্বীপের ২.৩, ভুটানের ৫.৭, শ্রীলঙ্কার ৩.২, নেপালের ২.২ এবং পাকিস্তানের ২.৩। আর বাংলাদেশের স্কোর ২.৪। অর্থাৎ সব প্রতিবেশীর তুলনায় আমরা ভালো করছি না।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশও (টিআইবি) নিয়মিতভাবে জরিপের ভিত্তিতে দুর্নীতি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করে থাকে। টিআইবি একটি তদন্তকারী সংস্থা নয় – তদন্ত পরিচালনা করা সংস্থাটির ম্যাণ্ডেটও নয়। আর তদন্ত করতে চাইলেও দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তদের তথ্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান টিআইবিকে দিতে, এমনকি এ ব্যাপারে সহায়তা করতেও বাধ্য নয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে কারা দুর্নীতিবাজ কিংবা কারা কতটুকু দুর্নীতি করেছে তা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। তাই টিআইবি প্রদত্ত জরিপনির্ভর তথ্যগুলো দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে শুধুমাত্র ধারণাই প্রদান করতে পারে – দুর্নীতিবাজদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হাজির করতে পারে না। আর টিআইবির সাম্প্রতিক জরিপগুলো থেকে দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে মাইক্রো বা ব্যাষ্টিক পর্যায়ে সরকার সফলতা প্রদর্শন করতে পারছে না। গত বছরের (২০১০ সালের) খানা জরিপ থেকে তাদের উপসংহার: কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে। অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে জনগণের ভোগান্তি ক্রমাগতভাবে বাড়ছে বলেই ধারণা পাওয়া যায়।

অনেকের ধারণা যে, দুর্নীতি এখন আমাদের সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে শুধু বিস্তৃতই হয়নি, এটির স্বরূপও বদলে গিয়েছে। এক সময়ে সমাজের উচ্চ স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সকল সরকারি ক্রয় ও কন্ট্রাক্টের একটি অংশ উৎকোচ হিসেবে নিতেন। সে ঐতিহ্য এখনও বহুলাংশে বিরাজমান। বর্তমানে এর সাথে ফায়দাতন্ত্র যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখন ক্ষমতাধররা আর কন্ট্রাক্ট থেকে তাঁদের অংশ নিয়েই শুধু সন্তুষ্ট নন, তাঁরা পুরো প্রকল্প বা কার্যক্রমকেই তাঁদের কর্মী-সমর্থক ও অনুগতদের জন্য ফায়দা হিসেবে ব্যবহার করছেন। যার ফলে বিভিন্ন কাজে অর্থ ব্যয় হলেও, সেগুলো সুচারুভাবে বাস্তবায়ন হয় না বা সেগুলো নিম্নমানের হয়। আর এ ফায়দা প্রদানের নীতির ফলে টেণ্ডারবাজি আজ ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত থাকলে অন্যায় করে পার পাওয়া যায়, তাই টেণ্ডারবাজির সাথে যুক্ত হয়েছে চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ইত্যাদি। এগুলো আজ ব্যাপকভাবে, বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার লাভ করেছে।

অনেকের ধারণা যে, আমাদের দেশে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার এক ধরণের আঁতাতের ফসল। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তারা এ আঁতাতের অংশ। আর এ আঁতাতের ফলেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দূরূহ, কারণ দুর্নীতিবাজরা দল-মতের উর্ধ্বে ওঠে একে অপরকে রক্ষা করে। এছাড়াও দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকরাই তাদের অর্থ-বিত্ত 'বিনিয়োগ' করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ক্রমাগতভাবে 'ক্রয়' করে নিচ্ছেন। তারা 'রুলিং ক্লাস' বা শাসক শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, আমাদের 'হাউজ অব দি পিপল' বা মহান সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্যদের অন্তত ৬০ শতাংশ ব্যবসায়ী এবং প্রতিষ্ঠানটি বস্তুত এখন কোটিপতিদের ক্লাব। তাই সত্যিকারার্থেই দুর্নীতি দমন করতে হলে আজ নতুন ধরণের কৌশলের প্রয়োজন হবে।

নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা' গ্রহণকে অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় – দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের পরই – গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছে: "দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদের বিবরণ দিতে হবে। দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, কালো টাকা ও পেশি শক্তি প্রতিরোধ নির্মুলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" এছাড়াও ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব বিষয়ে, বিশেষত দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি ও পেশিশক্তি নির্মুলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বারবার উচ্চারণ করে আসছেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তার 'দেশ বাঁচাও-মানুষ বাঁচাও' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে: "সমাজের সর্বস্তরে এবং সব শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে। এ বিষয়ে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক এবং অনেকক্ষেত্রে অতি প্রচারণা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সৎ ও নৈতিক জীবনযাপন করলেও বিশেষত বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। সেই লক্ষ্যে-

- বিএনপি নির্বাচিত হলে দুর্নীতি দমন এবং দুর্নীতির উৎসগুলো রুদ্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেবে।
- রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সব প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয় এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের অন্যায় প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা নির্দয়ভাবে দমন করা হবে।
- বিগত বিএনপি আমলে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা হবে।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচারণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিডিয়া ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

- নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করতে হবে।"

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আমাদের দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল। গত বিশ বছরে দল দু'টি দুই দুই বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক তাদের কর্মী-সমর্থক। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের দিকে তাকালে কারুরই সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে আমাদের দেশে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার বিরাজমান। তবে দুর্ভাগ্যশত এ অঙ্গীকার মূলত কাগজে-কলমে। কী আওয়ামী লীগ, কী বিএনপি কোনো আমলেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং দুর্নীতির 'রাজনীতিকীকরণ' করা হয়েছে। বস্তুত রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়ই আমাদের দেশে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং তা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে।

আমাদের দেশে কথার সাথে যে কাজের মিল নেই তা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি ব্যক্তিদের দিকে তাকালেই বুঝা যাবে। গত জাতীয় সম্মেলনে বিএনপি দুর্নীতিবাজ বলে জনশ্রুতি আছে এমন প্রায় সবাইকেই পুনর্বাসন করেছে। এর আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রদান করেছে। তেমনিভাবে আওয়ামী লীগও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত, যদিও যান্ত্রিক কারণে পরবর্তীতে উচ্চ আদালত থেকে খালাসপ্রাপ্ত, বেশ কয়েকজনকে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান, এমনকি নির্বাচনের পর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছে। নিঃসন্দেহে সরকার ও বিরোধী দলের এসকল সিদ্ধান্ত দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এছাড়াও আমাদের বর্তমান সংসদসদস্যদের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে গুরুতর অসাদাচরণের অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮ জন সংসদসদস্য মিথ্যা হলফনামা দিয়ে পূর্বাচলে প্লটের জন্য রাজউকে দরখাস্ত করেছেন (*প্রথম আলো*, ২৭ জানুয়ারি ২০১০)। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ এবং নিসন্দেহে দুর্নীতির আওতায় পড়ে। এছাড়াও সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্তত ৪৮জন সংসদ সদস্য তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য, যা *জাতীয় সংসদ কার্যপ্রনালী বিধির* সুস্পষ্ট লঙ্ঘন (*আমাদের সময়*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১) এবং একটি অসদাচারণ। এছাড়া অন্য কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে দখলদারিত্ব, সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক, পুঁজি বাজারে কারসাজির এমনকি হত্যার অভিযোগ উঠেছে। দুর্ভাগ্যবশত এদের কারো বিরুদ্ধেই এপর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের আন্তরিকতার নিদর্শন বহন করে না।

আওয়ামী লীগ তার দিনবদলের সনদে দুর্নীতি দূরীকরণ ও সুশাসন সম্পর্কিত অগ্রাধিকারে রাষ্ট্র এবং সমাজের সকল স্তরে ঘুষ ও দুর্নীতি উচ্ছেদের অঙ্গীকার করা হয়। একইসাথে অঙ্গীকার করা হয় চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি ইত্যাদি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার। দুর্ভাগ্যবশত এ সকল ক্ষেত্রে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না, কারণ এসকল গর্হিত কাজে নিয়োজিতদের প্রায় সকলেই সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দিনবদলের সনদে আরও অঙ্গীকার করা হয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদসদস্য এবং তাদের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস বাৎসরিকভাবে জনসম্মুখে প্রকাশ করার। এছাড়াও অঙ্গীকার করা সংসদসদস্যদের একটি আচরণবিধি প্রণয়নের। এসকল উদ্যোগ নিসন্দেহে দুর্নীতি প্রতিরোধে অবদান রাখতে পারত, একইসাথে এর মাধ্যমে দুর্নীতির সমস্যার সমাধানে সরকারের আন্তরিকতার বিষয়েও জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হত। এ ব্যাপারেও সরকার কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকারের সবাই আয়কর দেন। আয়কর দেওয়ার সময় সম্পদের হিসাব দেওয়া হয়। নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ও সম্পদের হিসাব দেওয়া হয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে তা দেখতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমাদের হিসাব দিতে কোনো অসুবিধা নেই, সময় হলেই তা প্রকাশ করা হবে (*প্রথম আলো*, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)। প্রসঙ্গত, সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও, বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যরাও সম্পদের হিসাব প্রকাশ করেননি। তাই এটি বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কোনো কার্যকারিতা নেই।

বর্তমান সরকারের দুদককে অকার্যকর করার অপচেষ্টা

দুর্নীতি নির্মূলের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্ষমতায় এলেও এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কার্যক্রম এ পর্যন্ত ইতিবাচক নয়। বরং সরকারের কার্যক্রম দুর্নীতির ও দুর্নীতিবাজদের প্রতি আপোসকামিতারই প্রতিফলন। গত ২৬ মাসে কোনো রাঘব-বোয়ালের দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তি হয়নি। প্রকারান্তরে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতির আভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির সাজা, মূলত যান্ত্রিক কারণে, উচ্চ আদালত কর্তৃক মওকূপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এটর্নি জেনারেলের অফিস আদালতে তাদের যুক্তি উত্থাপনকালে কোনো কোনো অভিযুক্তের পক্ষ নিয়েছেন। আদালতের ভুমিকা নিয়েও কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠেছে।

দুর্নীতি দমন আইন নিয়ে সরকার যা করছে তাতেও তাদের আপোসকামিতাই প্রদর্শিত হচ্ছে। দুর্নীতি দমনের দায়িত্ব এক সময়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ওপর অর্পিত ছিল। দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে ব্যুরোর ব্যর্থতার কারণে বেশ কয়েকবছর আগে নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের চাপে *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪* প্রণয়ন করা হয়। ২০০৪ সালের আইনের মাধ্যমে আগের আইনের অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা দূর করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুদকের কমিশনার নিয়োগে জটিলতা, নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন ও জনবল কাঠামো নিয়ে সরকারের অসহযোগিতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ সকল জটিলতার অবসান ঘটানো এবং কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দু'টি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ২০০৪ সালের আইনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। একইসাথে কমিশনের জন্য একটি বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়। পুনর্গঠিত কমিশন দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে জোরদার এবং কয়েক শ' দুর্নীতির মামলা দায়ের করে। অভিযুক্তদের কারো কারো শাস্তিও হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনকে 'একটি স্বাধীন, স্বশাসিত ও নিরপেক্ষ' প্রতিষ্ঠানে [ধারা ৩(২)] পরিণত করা হয় (স্বশাসিত শব্দটি যোগ করা হয়)। এছাড়াও এর মাধ্যমে কমিশনের আবশ্যক পূর্বানুমোদন ব্যতীত কমিশনের কর্মকর্তাদের ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত গৃহীত কার্যাবলীর ভূতাপেক্ষ (ex post facto) অনুমোদনের বিধান করা হয় [ধারা ১৮(২)]। অর্থাৎ ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারি মাসে কমিশনের সচিব কর্তৃক সম্পদের হিসাব চেয়ে প্রদত্ত সকল নোটিশের বৈধ্যতা এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। উপরন্তু এর মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাদেরকে এজহারের পূর্বেই অনুসন্ধানের প্রয়োজনে, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয় [ধারা ২১]। একইসাথে অধ্যাদেশের মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের অপরাধসমূহকে আমলযোগ্য ও জামিন অযোগ্য করা হয় (ধারা ২৮ক)। আরও বিধান করা হয় যে, কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো আদালত দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে কোনো অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করবে না [ধারা ৩২]। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০১ এর অধীনের অপরাধসমূহও এর মাধ্যমে কমিশনের আওতায় আনা হয়।

বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশদ্বয়কে অনুমোদন করেনি। বরং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইন সংশোধনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা সংসদে ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি কমিশনের আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে মন্ত্রী পরিষদের অধীনে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। যেহেতু কমিশনের নিজস্ব সম্পদের উৎস নেই, তাই কমিটি আইন থেকে 'স্বশাসিত' শব্দটি বাদ দেয়ার সুপারিশ করে। কমিটি সরকার কর্তৃক কমিশনের সচিব নিয়োগের সুপারিশও করে। এছাড়াও কমিশনকে রাষ্ট্রপতির নিকট জবাবদিহি করার পক্ষে কমিটি সুপারিশ করে। পর্যালোচনা কমিটির সবচেয়ে বিতর্কিত সুপারিশটি হলো সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি।

গত ২৪ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে মন্ত্রীপরিষদ দুদক আইনের কতগুলো সংশোধনী অনুমোদন করে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মন্ত্রীপরিষদ মূলত পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশগুলোই অনুমোদন করে, যদিও কেউই এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। এমনকি দুদকের চেয়ারম্যানেরও অনুমোদিত সংশোধনীগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই – তিনিও নাকি সংবাদপত্র পড়েই এ সম্পর্কে জেনেছেন (*প্রথম আলো*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১) – যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আরো অবিশ্বাস্য যে, শোনা যায়, সংসদের বর্তমান অধিবেশনেই, নাগরিক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জানার আগেই, অনুমোদিত সুপারিশগুলো সংসদে পাশ করা হবে।

আমরা জানি না দুর্নীতি নির্মূলে অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকার কেন মন্ত্রীপরিষদ অনুমোদিত দুদক আইনের সংশোধনীগুলো নিয়ে লুকোচুরি খেলছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক, যার স্বীকৃতি আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকদের কাছ থেকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মালিকের প্রতিনিধিদের কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের (রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) কোনো কিছুই গোপন রাখার এখতিয়ার নেই। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের *স্টেট অফ ইউপি বনাম রাজ নারায়ণ* [(১৯৭৫)৪ এসসিসি ৪২৮] রায় প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত মালিকদের কাছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যে বৈশিষ্ট্যের কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সামন্তবাদী প্রথার থেকে ভিন্ন – সামন্তপ্রভূদের স্বচ্ছতা প্রদর্শন এবং কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

প্রসঙ্গত, সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির অতীতের এমনি একটি বিধান ২০০৪ সালের আইনের মাধ্যমে রহিত করা হয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সম্পূর্ণ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত পর্যালোচনা কমিটির এমন সুপারিশ সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, কারণ এর মাধ্যমে তাদেরকে এক ধরনের 'ইনডেমনিটি' বা সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুদকের স্বাধীনতাও নগ্নভাবে খর্ব করা হয়েছে।

সরল বিশ্বাসে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে সরকারি কর্মকর্তারা দায়মুক্ত হতে পারলে, অন্যান্য নাগরিকদের বেলায়ও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? নিঃসন্দেহে এ ধরনের বিধান সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদের, যাতে বলা হয়েছে 'আইনের চোখে সবাই সমান' – সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা তাদের কৃতকর্মের জন্য মালিকদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না, তা হতেই পারে না। এছাড়াও, যেহেতু দুর্নীতি ত্রিপক্ষীয় – রাজনীতিবিদ, সরকারি কমকর্তা ও ব্যবসায়ীদের – আঁতাতের ফসল, সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে পূর্বানুমতির বাধ্যবাধকতা, দুদককে একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন গণপরিষদের শেষ অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে বলেছেন, সরকারি কর্মকর্তারা ভিন্ন গোত্র নন এবং তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে বেশি অধিকার ভোগ করতে পারেন না।

তবে সর্বশেষ আমরা যতটুকু জেনেছি, মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধনী, পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ থেকেও, আরও অনেক বেশি অযৌক্তিক ও ভয়ানক। শোনা যায় যে, অনুমোদিত সংশোধনী পাশ হলে দণ্ডবিধির ২১ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত 'জনসেবক'দের কারো বিরুদ্ধেই সরকারের অনুমতি ছাড়া দুদক মামলা করতে পারবে না। দণ্ডবিধির এ ধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের

নির্বাচিত সদস্য পর্যন্ত সকলেই জনসেবক। এছাড়াও প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারী, সামরিক কর্মকর্তা, বিচারপতি প্রমূখ জনসেবকের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ বিধান আইনে সংযোজিত হলে দুদকের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা এমনভাবে খর্ব হবে যে, সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া সরকার উল্লেখযোগ্য কারো বিরুদ্ধেই মামলা করতে পারবে না। ফলে দুদক একটি অকার্যকরই নয়, অর্থহীন প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হবে। তাই এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, মন্ত্রী পরিষদ অনুমোদিত সংশোধনীগুলো গোপন রাখার এত অপচেষ্টা!

দুদক আইনের বিবর্তন

২০০৪ সালের দুদক আইনের বিধান	২০০৭ সালের অধ্যাদেশের বিধান	২০১১ সালের অনুমোদিত বিধান???
সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই	সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই	'জনসেবক'দের বিরুদ্ধে, সকল স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাগণ যার অন্তর্ভুক্ত, মামলার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন
সংসদে উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল	সংসদে উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল	কমিশন রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ
তদন্তের কোনো সময়সীমা নেই	তদন্তের সময়সীমা ৬০ দিন নির্ধারিত	তদন্তের সময়সীমা ১২০ দিন নির্ধারিত
অন্য সংস্থাগুলো দুদককে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে বাধ্য	অন্য সংস্থাগুলো দুদককে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে বাধ্য নয়	অন্য সংস্থাগুলো দুদককে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে বাধ্য নয়
সাক্ষীদের সমন জারী ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ করার বিধান		সাক্ষীদের সমন জারি করার ক্ষমতা বিলুপ্তিকরণ
		দুদকের কোনো কর্মকর্তা সহকর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে পারবেন না।
শপথের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের বিধান		শপথের মাধ্যমে স্বাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন না।
		'হুইসেল ব্লোয়ার'দের বা দুর্নীতির তথ্য ফাঁসকারীদের পরিচয় গোপন রাখা হবে
মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে কোনো শাস্তির বিধান নেই	মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে কোনো শাস্তির বিধান নেই	মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে ৫ বছরের জেল ও জরিমানার বিধান
সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে দুদকের এখতিয়ার	সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের এখতিয়ার	সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের এখতিয়ার
স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান	স্বশাসিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান	স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান

মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক কমিশনকে রাষ্ট্রপতির কাছে জবাবদিহি করার সুপারিশের যৌক্তিকতা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ... প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।" তাই দুদককে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ করলে প্রতিষ্ঠানটি মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহী বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে কমিশনের স্বাধীনতা চরমভাবে ক্ষুন্ন হবে। তবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। আর দুদকের দায়বদ্ধতা যদি নিশ্চিত করতেই হয়, তাহলে বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবা উচিত। এছাড়াও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে দুদকের কমিশনারদেরকে অপসারণের বিধান আইনে এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মন্ত্রীপরিষদের আরেকটি সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে বাধা অপসারণের লক্ষ্যে দুদকের পক্ষ থেকে ২০০৪ সালের আইনের ১৯(১)-এ 'আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন' শব্দগুলি সংযোজনে দুদকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। পর্যালোচনা কমিটি এ প্রস্তাবের বিপক্ষে সুপারিশ করে এবং মন্ত্রীপরিষদ তা গ্রহণ করে। আমরা মনে করি যে, দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে সত্যিকারার্থে জোরদার ও ফলপ্রসূ করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধানাবলীকে অন্যান্য আইনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগে শাস্তির বিধানও আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। মিথ্যা মামলার মানদণ্ড কী? যে কোনো মামলায় হারলেই কি ধরে নেওয়া যায়, মামলাটি মিথ্যা ছিল? আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অনেক চিহ্নিত দুর্নীতিবাজও আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছেন। আদালত যান্ত্রিক কারণে অনেকের শাস্তি বাতিল করেছেন। দক্ষতার অভাবের কারণে দুর্বল তদন্ত, সরকার ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার অসহযোগিতা, সাক্ষীর বৈরীতা, রাষ্ট্রের আইনজীবীদের বিতর্কিত ভূমিকা, আদালতের ভুল ব্যাখ্যার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি সম্প্রতি দুর্নীতির দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই বলে এসকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাকে কি মিথ্যা মামলা বলা যাবে? এ ধরনের বিধান আইনে পরিণত হলে, মামলায় হেরে যাওয়ার ভয়ে দুদকের কর্মকর্তারা ভবিষ্যতে দুর্নীতির মামলা দায়েরের

ক্ষেত্রে প্রবলভাবে নিরুৎসাহিত হবেন, যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবে। এছাড়াও দুদকের মামলার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধান করা হলে, অন্য সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে তা নয় কেন?

দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করতে হলে আরেকটি বিষয়ের ওপর মনোযোগ দিতে হবে, যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত সপ্তাহে দুদকের দুইজন কমিশনার অবসরে গিয়েছেন। একটি বাছাই কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে কমিশনারদের শূণ্যপদ পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু ইতোমধ্যেই সরকারের প্রতি অনুগত দুইজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তাকে দুদকের কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে বলে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন বেরিয়েছে (*ডেইলী স্টার*, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)। তাহলে কি আমরা ২০০৪ সালে, চার দলীয় জোট সরকারের আমলের, দুদক কমিশনার পদে নিয়োগের পুরনো কারসাজিরই পুনরাবৃত্তি দেখব?

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর সাবেক বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে চেয়ারম্যান করে দুদকের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়। তখন দলীয় বিবেচনায় বাছাই কমিটির সুপারিশের বাইরের কাউকে কাউকে কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বাছাই কমিটির সুপারিশের আগেই দলীয় আনুগত্যের কারণে নিয়োগ চূড়ান্ত করার বর্তমান সিদ্ধান্ত দুদককে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রাখার বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। এছাড়াও দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান, যিনি ইতোমধ্যেই জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, একজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা। এমতাবস্থায় কমিশনে আরও দুইজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান কি যুক্তিযুক্ত হবে? সরকার কর্তৃক দুদকের সচিব নিয়োগও প্রতিষ্ঠানটির স্বাধীনতাকে খর্ব করবে।

নাগরিক হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন

দুর্নীতি সমাজের সাধারণ মানুষদেরকে বঞ্চিত করছে – বস্তুত সমাজের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট দুর্নীতি ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র মানুষের পেটে লাথি মারার সমতূল্য। এ সমস্যা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকেও ব্যাহত করছে। আমাদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারাদেশে বর্তমানে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারকদের পক্ষে বারবার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেছে। তবুও এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে না। বরং এ ব্যাপারে আমরা যেন উল্টো দিকেই যাচ্ছি। একের পর এক সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও আন্তরিকতার অভাবেই তা ঘটছে।

মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক সম্প্রতি অনুমোদিত দুদক আইনের সংশোধনীগুলো দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সরকারের আন্তরিকতাকেই শুধু প্রশ্নবিদ্ধই করে না, নাগরিক হিসেবে আমাদেরকেও দারুণভাবে শঙ্কিত করে। এগুলো আইনে পরিণত হলে সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া দুদক বস্তুত কারো বিরুদ্ধেই মামলা করতে পারবে না। ফলে শুধু নখ ও দন্তহীন বাঘেই নয়, দুদক একটি খোঁড়া, অন্ধ ও শক্তিহীন প্রাণীতে পরিণত হবে – ফলে এটি রাখা না রাখা একই কথা। এছাড়াও মন্ত্রীপরিষদের অনুমোদিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোকে, এমনকি দুদক থেকে গোপন রাখার অপচেষ্টা এবং এ নিয়ে লুকোচুরি একটি নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে কোনোভাবেই কাম্য নয়।

দুদকের দুইজন কমিশনার সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। এ দুইটি শূণ্যপদ পূরণের বিষয়টি নিয়েও আমরা চিন্তিত। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন দলের প্রতি অনুগত দুইজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তাকে পদ দুইটিতে নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে। আমরা আশা করি যে, বাছাই কমিটি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে এবং সবচেয়ে যোগ্য, সৎ, সাহসী ও দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগের সুপারিশ করবে। আমরা আরও আশা করি যে, কমিটি তাদের সুপারিশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রদর্শন করবে এবং তাদের বিবেচনাধীন ব্যক্তিদের নাম চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করার আগেই সেগুলি প্রকাশ করবে, যাতে নাগরিকরা তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ পায়। কোনোভাবেই যেন মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে – যৌন অপরাধে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের পর তা বাতিল করা হয় (*সমকাল*, ১৫ জুলাই, ২০১০)।

আমাদের দাবি যে, কমিশনের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাগণ তাঁদের সম্পদের হিসাব প্রদান করবেন। তাঁদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণীত হবে এবং তাঁরা তা মেনে চলবেন। একইসাথে আমরা দুদককে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করারও দাবি করছি।

পরিশেষে, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় বর্তমানে যে রাজনৈতিক সুনামি ঘটছে তার প্রতি সকলের, বিশেষত ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ নিবন্ধ শেষ করতে চাই। তিউনিশিয়া, মিশর, লিবিয়া, বাহরাইন প্রভৃতি দেশের সামন্তবাদী প্রভূরা দুর্নীতির কারণেই সম্প্রতি হয় বিতাড়িত হয়েছেন কিংবা হবার অপেক্ষায়। তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরা ও নিজেদের পরিবারের সদস্যরা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। আর তা সম্ভব হয়েছে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বাধ্যবাধকতা তাদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না বলেই, যদিও গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। আমাদের অতীতের নির্বাচিত সরকারগুলোও বহুলাংশে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার ধার ধারেনি, যার মূল্যও তাদেরকে দিতে হয়েছে। বর্তমান সরকার দিনবদলের অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেছে। সত্যিকারের দিনবদল হতে হলে ক্ষমতাধরদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। আশা করি, সরকার ইতিহাস থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করবে।